**বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫**
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.001

# জীবনানন্দ দাশের গল্প : প্রেমহীন সম্পর্কের আখ্যান

চঞ্চল কুমার বোস*

**সারসংক্ষেপ**

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) মূলত কবি। আধুনিক কবিতায় তাঁর দূরসঞ্চারী প্রভাব থাকলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেও জীবনানন্দের একটি স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই কথাসাহিত্যিক-পরিচিতিটি অনেকটাই আড়ালে থেকে গেছে। বেশকিছু উপন্যাস রচনার পাশাপাশি দুই শতাধিক গল্পও রচনা করেছেন তিনি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা এবং নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা তাঁর গল্পগুলোতে বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে। জীবনানন্দের গল্প অনেকাংশে আত্মজৈবনিক কিন্তু আধুনিক মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা এবং জটিল জৈবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিও মুখ্য হয়ে উঠেছে এসব গল্পে। বর্তমান প্রবন্ধে সে দিকটিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। গল্পকার হিসেবে জীবনানন্দের সৃজন-প্রতিভার ভিন্ন একটি দিক উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

**চাবি-শব্দ :** জীবনানন্দ দাশ, গল্প, উপন্যাস, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী, আত্মজৈবনিক।

কবিতা যদি তাঁকে পথের সন্ধান দিতে পারে, তবে গল্প সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালে হয়ত থেকে যাবে–নিজের লেখা গল্প সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ এধরনের একটি কথা বলেছিলেন বলে শোনা যায়। নিজের গল্প সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা-যে জীবনানন্দের ছিল না, সেটা বোঝা যায় এজাতীয় মন্তব্যে। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী মনে করেন– 'কবি জীবনানন্দ দাশও কথাসাহিত্যের জগতে সহজ অধিকারে প্রতিষ্ঠার দাবি প্রচ্ছন্ন রেখেই বিদায় নিয়েছিলেন।'[১] কিন্তু কবির মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে ক্রমাগত আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হতে থাকা গল্প জীবনানন্দের এই মনোভাবকে কতোটুকু সমর্থন জোগায়, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। সেই বিবেচনার ক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া গল্পসমূহই হতে পারে প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। কবিতায় যে-জীবনানন্দ ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিস্তীর্ণ পরিসর অবলোকন করেছেন, গল্পে তাঁর সেই বৈশ্বিক দৃষ্টি মূলত কেন্দ্রমুখী। এই কেন্দ্রিকতা সংকুচিত হতে হতে কবির একান্ত নিজস্ব নিবিড় মনোভূমে ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের গল্প কেবল তাঁর নিজের গল্প নয়, আলো-অন্ধকার, স্বপ্ন ও জাগর চৈতন্যের মধ্য দিয়ে সেখানে ভিড় করেছে আধুনিক শেকড়হীন মানুষেরা। তাঁর গল্পগুলোতে আধুনিক নরনারীর সামাজিক ও মনোজাগতিক সংকটের বিরূপ প্রতিচ্ছবি যেভাবে উঠে এসেছে, তা একইসঙ্গে অভিভূত করেছে পাঠক ও বৌদ্ধিক সমাজকে। জীবনানন্দের গল্প মূলত তাঁর আত্মগত চৈতন্যের

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রোজেকশন হলেও সমকালীন নরনারীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবনযন্ত্রণার কথাও শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। অমলেন্দু বসু জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> জীবনানন্দ যে মানুষের স্বরূপ জানার জন্য এবং সেই জ্ঞান ভাষামাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য প্রচণ্ড আলোড়ন বোধ করেছিলেন আপন চিত্তে, সে আলোড়নের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অবশ্যই তাঁর কাব্যে, তবু তাঁর গদ্যকাহিনীগুলি একই দুর্দম আলোড়ন থেকেই উদ্ভূত।[২]

জীবনানন্দের গল্প রচনার কাল মূলত ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সক্রিয় কর্মজীবনে ফিরে আসেন। এই পর্যায়ে তাঁর গল্প ব্যক্তিজীবনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমাজ পরিধির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বরিশালের মফস্বলীয় জীবন এবং বিকাশমান কলকাতা– এই দুই প্রান্তের টানাপড়েনে জীবনানন্দ ছিলেন ত্রস্ত, দোলাচল। অন্যদিকে কলকাতার বৌদ্ধিক শ্রেণির সঙ্গে তাঁর সামাজিক সংযুক্তিও ছিল না বললেই চলে। অন্তর্মুখী জীবনানন্দ ছিলেন আপন বৃত্তে স্থির, প্রায় সমাজবিবিক্ত এবং নিঃশিকড়।

জীবনানন্দের ছোটগাল্পিক শিল্পদৃষ্টির নির্মাণে কল্লোলীয় চেতনার শুশ্রূষা পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে শূন্যগর্ভ সময়, ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকট, জীবিকার অনিশ্চয়তা, চিরায়ত ধ্যানধারণা সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা, যৌনবৈকল্য এবং সার্বিক নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে তীব্র হতাশা জীবনে তৈরি করে গভীর খাদ। সেই খাদে জমে ওঠা জীবনের পাঁকে কোথাও কোনো আলো দেখতে পাননি তিরিশের কবি ও লেখকরা। ফলে শিল্প যেন মর্বিডিটির স্মারক হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা এবং তার নিরাশ্রয় মনোভঙ্গি সাহিত্যে সৃষ্টি করে এক জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড। এ যুগের অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পর্কে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন :

> এমনি করে একদিকে তারা জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছে, নেতিবাচক সংশয়বোধে ভরে গেছে তাদের মন, তারা বিদ্রোহীর মত মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে যা কিছু পুরাতন সব। অন্যদিকে আবার উদ্ভ্রান্ত বিহ্বলতায় রোম্যান্টিকের মত সম্মুখের অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত ঠিক নির্দিষ্ট কোন কিছুর নিশ্চিত প্রত্যাশায় নয়, যৌবনের স্বাভাবিক বিশ্বাসপ্রবণতার প্রেরণায়।[৩]

জীবনানন্দের গল্প কেবল কবির লেখা গদ্যকথন নয়, ঘটনার ইঙ্গিত ও ইশারার আকস্মিক উদ্ভাসনে জীবনের অজানা তথ্য ও মীমাংসার দ্যুতি জীবনানন্দের গল্পকে আলোকিত করেছে। রূপে ও আকারে নয়, প্রকৃতি ও স্বভাবে গল্প হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৌল প্রত্যয় হলো জীবনের অনুক্ত ইমপ্রেশনকে দ্যোতিত করা। যুদ্ধোত্তর কালের জটিল জিজ্ঞাসার উন্মোচনে ভাষার ইঙ্গিতময় সূক্ষ্মতা এবং প্রতীকায়নের নৈপুণ্য সৃষ্টিতে জীবনানন্দ কল্লোলীয় ভাষাকাঠামোর সমীপবর্তী হয়ে ওঠেন। ব্যক্তির মনোগহিনের অপরিচিত অনুভূতির প্রকাশে ভাষাও হয়ে ওঠে কতগুলো চিহ্নের সমষ্টি। কিন্তু এই চিহ্নভাষার অভিমুখ বা গতিপথ নরনারীর অন্তর্গূঢ় জটিলতার স্তর লক্ষ্য করেই প্রকাশোন্মুখ।

জীবনানন্দের গল্প ভাষার সরল-জটিল প্রতীকায়নের সাহচর্যে স্বকীয়। *কল্লোলের* লক্ষ্যকেই জীবনানন্দ ধারণ করেছেন লেখায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন :

> 'কল্লোলকে' নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও দ্যুতি দেবার জন্য ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলির বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে–আরামরমণীয় পথ–যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু 'কল্লোলের' পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।[৪]

জীবনানন্দের গল্প প্রবলভাবে ব্যক্তিপ্রধান এবং আত্মজৈবনিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমকালীন সাহিত্যচিন্তার আঁচ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কল্লোলীয় শিল্পদৃষ্টির উত্তরাধিকার যেমন তাঁর কবিতায় প্রবল হয়ে উঠেছিল, তেমনি গল্পরচনার সূচনালগ্নে লিবিডোচেতনা তাঁকে সমকাল-অন্তর্গত করে তোলে। জীবনানন্দের প্রথম গল্প 'ছায়ানট' ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয় বলে জানা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন যে, এ গল্প মিথুন-সমীক্ষণের এবং মৈথুন শক্তির প্রেরণাকেই জীবনের মুখ্য প্রেরণা হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে। রেবা, ডাক্তার, কবি এবং স্বয়ং লেখককে ঘিরে এ গল্পে যে পরিসর গড়ে উঠেছে তা' এক বিমিশ্র মৈথুন জগৎ। এখানে সম্পর্কের সূত্রগুলো অচেনা–লিবিডোতাড়নায় রেবা ও ডাক্তার তৈরি করে মৈথুন চিত্র। লেখকের প্রতি রেবার একধরনের কন্যাসুলভ বাৎসল্যের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও লেখক অনুভব করেন অবচেতনায় রক্তের ভেতর তার অজান্তেই অন্য এক কামনার জন্ম হয়। পাশের ঘরেই ডাক্তারের সঙ্গে ভোগতৃপ্ত রেবার দিকে তাকিয়ে লেখক-নায়ক নিজের রুগ্‌ণ জীবনের জানালায় খোলা আকাশটিকে আবার ফিরে পেয়েছিলেন। এই গল্পের গোড়ায় ফ্রয়েডীয় লিবিডো-মনস্তত্ত্বের উপস্থিতি প্রবল এবং কল্লোলীয় জীবনাবেগের সঙ্গে তা' সন্দেহাতীতভাবে সম্পর্কিত।

এক বিমূঢ় কালের কবি জীবনানন্দ। ক্ষুব্ধ ও অনির্দেশ্য সময়ের এক অনিবার্য ছায়া তাঁর কবিতা ও গল্পে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বৈরী বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক চাপ জীবনের বাঁধা ছককে তছনছ করে দেয়। ভঙ্গুর বিন্যাসহীন অব্যবস্থিত সমাজ চেপে ধরে ব্যক্তির অস্তিত্বকে। জীবনানন্দও এই সময়ের চাপে ভেঙে পড়া এক মানুষ। বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক জীবনে কখনোই সুস্থির হতে না-পারা জীবনানন্দ পুঁজিবাদী সমাজের মৃগয়ায় সফল হতে পারেননি। পারিবারিক-সাংসারিক জীবনে ছিল সেই অসন্তোষ ও ব্যর্থতা। কবিতার মতো তাঁর গল্পেও প্রেম, দাম্পত্য সংকট, নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যুময়তার অনুষঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির চিত্রময়তা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা জীবনানন্দের গল্পে ব্যক্তিজীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রকৃতি প্রখরভাবে সংবেদনশীল তাঁর গল্পে এবং ব্যক্তির নির্জন মনের যন্ত্রণা-একাকিত্বের উন্মোচনে প্রকৃতি রসপরিণামী সংকেত তৈরিতে প্রভাবক হয়ে উঠেছে।

প্রেম, দাম্পত্য জটিলতা, ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য. হতাশা, অবসাদ, বিমর্ষতা এবং সমকালের বাণিজ্য পুঁজির দাপটে পিছিয়ে পড়া মানুষের সামগ্রিক ব্যর্থতাবোধের পটভূমিকায় জীবনানন্দের একাধিক গল্প রচিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রেমের বহুমুখিতা, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতা, পুরোনো প্রেমের স্মৃতিকাতরতা, প্রেমিক-প্রেমিকার বিগত দিনের ঘনিষ্ঠতা, আগ্রহ ও তুচ্ছতার তীব্র বিধুরতা জীবনানন্দের গল্পে প্রবলভাবে ছায়া ফেলেছে। জীবনানন্দীয় এই প্রেম সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

> জীবনানন্দের ছোটগল্পে প্রেম অনির্বচনীয় মৃগনাভি যন্ত্রণা, যার আহ্বানে থাকে আনন্দ-সুগন্ধ ও অনিবার্য মরণাকর্ষণ। জীবনের প্রাত্যহিকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রেমের পবিত্র স্নানে স্নিগ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি চরিত্রের। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জীবনে মানবীয় বিপর্যয় ও মূল্যবোধের সামগ্রিক ধসের মুখোমুখি হয়ে ভাবনাপ্রতিভায় শীর্ষস্পর্শী নরনারীর হৃদয়সংকটের কার্যকারণ-ফলাফল গল্পের বিষয়বস্তু।[৫]

'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল রূপটি প্রত্যক্ষ করা যাক। এক ভঙ্গুর অসম সমাজকাঠামোয় স্থাপিত ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপড়েন 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে উঠে এসেছে। প্রত্যাশিত ব্যবস্থা কিংবা পরিবেশ আয়ত্তের মধ্যে না থাকলে ভিন্ন বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয় বটে কিন্তু কোনো ব্যক্তিস্বরূপই তাতে তুষ্ট থাকে না। ফলে দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে হৃদয়হীনতা জন্ম নেয়, তৈরি হয় মাংসের ক্লান্তি ও গ্লানি। হেম ও অমূল্যর সাংসারিক সম্পর্ক চোরাবালির ফাটলে আটকে পড়া। তাই অমূল্য আলাদা বিছানায় শয়ন করে। বিয়ের পর অল্পদিন শরীরী উত্তেজনায় মেতে থাকলেও তাতে দ্রুতই ধস নামে। অমূল্য যেমন তাকে হৃদয় দিয়ে চর্চা বা অনুশীলন করেনি, হেমও তেমনি জীবনের মধুর প্রাত্যহিকতা থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেয়। ফলে অমূল্যর প্রতিদিনের ইচ্ছেগুলো ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় হেমের কাছে, হেমের চেহারার ভেতর থেকেও বেরিয়ে পড়ে অচেনা এক আদিমতা। 'চেহারার ভেতর কেমন একটা wild look-এর ওষুধ-বিষুদে বিশেষ কিছু–বিশেষ কিছু আর কেন? একেবারেও কিছু হবে না। চেঞ্জের দরকার, রাঁচি সুট করবে।'[৬] সময় ও বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়েছে বলে হেমের গানও কাউকে আর আকৃষ্ট করে না। ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো হেম পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে একসময়। এই ভঙ্গুর সময়ের চক্রে ব্যক্তির বিপন্নতা এ গল্পের প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে।

'বেশি বয়সের ভালোবাসা' ক্ষয়িষ্ণু সময় ও শূন্যতার গল্প। আভা ও তার সেজদার কথোপকথনে শিল্প, শিক্ষা, শিক্ষকতা এবং জীবনের অপরাপর বিষয় উঠে আসলেও মৌলিক জিজ্ঞাসায় তারা উভয়েই অমীমাংসিত এবং বৃত্তচ্যুত। এক প্রচ্ছন্ন বোহেমিয়ানিজম তাদের দুজনকেই ভেতরে ভেতরে উন্মূল করে রাখে। বি.এ পাস করে একাধিক চাকরি এবং সবশেষে শিক্ষকতায় স্থিত আভা, অন্যদিকে মেজদা আইসিএস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টরেট সবকিছুতেই ব্যর্থ হয়ে লন্ডনের একটি ইউনিভার্সিটি থেকে সামান্য একটি ডিগ্রি নিয়ে আসে। আভার সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে মেজদার আগ্রহ থাকলেও তিনি যে আর্টের প্রতি খুব নিষ্ঠাবান বা অনুভূতিশীল তা মনে হয় না। আভাকে

লেখালেখিতে তেমন উৎসাহিতও করেন না। এক ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের কথা বলে আভাকে বিয়ের জন্য আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করলেও আখ্যান শেষ হয় গভীর নিঃস্বতার মধ্যে :

> সুহৃৎ জানে আভাকে নিয়ে বিধাতার মতো সেও আজ একটু খেলল, ড্রয়িংরুম গুছানো হবে, সন্ধ্যা উৎরে যাবে, রাত হবে, মেয়েটি ছটফট করবে, কিন্তু তবুও আভার জীবনে কোনো রাজকুমার মন্ত্রীকুমার কোটালকুমারও নেই, ইঞ্জিনিয়ার নেই, কী আছে? অনেক অলিগলি দিয়ে হয়ত আরো গল্প লিখে কবিতা লিখে ফ্লার্ট করে একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে আভাকে, একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে সুহৃৎকে।[৭]

শূন্যতাও কখনো কখনো জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে স্পষ্ট করে। আভা ও তার মেজদার জীবনের অর্থহীনতার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ আধুনিক যন্ত্রণাতাড়িত মানুষের মনোজগতের বাস্তবতাকে ধরতে চেয়েছেন।

'সোনালি আভায়' দিকনির্দেশহীন অন্ধকারময় জীবনের কাছে ফিরে ফিরে আসার গল্প। সতীশের জীবন নিরানন্দ একাকিত্বের, মা কাছে থাকেন না সতীশের– যদিও সতীশ চেষ্টা করে মায়ের নির্দেশ মেনে চলতে ও তার চাওয়াগুলোকে পূর্ণ করতে। বাসার কাজের ছেলে তারাপদর সঙ্গে সতীশের সমস্ত ভাব বিনিময় এবং মতের আদানপ্রদান। গ্রন্থকীটের মতো বেশিরভাগ সময় বই পড়া এবং সোডা সেবন করার মধ্য দিয়ে সতীশ জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। একধরনের মর্বিডিটি তার সমস্ত দেহে-মনে। অনেক লোকের সংসারে বাস করতো বলে একদিন সতীশ নির্জনতা খুঁজতো কিন্তু এখন সে নিঃসঙ্গ। মা তার কাছে থাকেন না, স্ত্রী-সন্তান-পরিজন কেউ নেই। এই ক্লান্ত আটপৌরে জীবনে সতীশ মগ্ন হয় আত্মরতিতে। নির্জনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায় সতীশের সোনালি আভা। গল্পের প্রান্তিক উক্তিতে সতীশ বলছে, –'সমস্ত দিন অফিসে কাটিয়ে গোধূলিবেলায় আমার ঘরের ডেকচেয়ারে আবার এসে বসলাম। কেমন একটা সোনালি আভায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি।'[৮] ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে চাওয়া মানুষদের মতো সতীশ এ গল্পে বিপন্নতার অভিমুখী।

প্রেম ও লিবিডোর দ্বন্দ্বে তাড়িত তারানাথের মনোদৈহিক বিকারের গল্প 'ভালোবাসার সাধ'। বিয়ের পর প্রথম স্ত্রী অন্যত্র চলে যাওয়ায় চল্লিশ বছর বয়সেও তারানাথ বিপত্নীক। দেহের বয়স বাড়লেও দৈহিক বাসনার অবসান হয়নি তার। ফলে মনোদৈহিকতার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন লিবিডো প্রায়শ তপ্ত ও জোরালো রূপ নেয়। তাই বাসার কাজের ছেলেটির জায়গায় তারানাথ একজন স্ত্রীলোককে ঠাঁই দিতে চায়। তারানাথের এই আগ্রহের কারণ তার অন্তর্গত যৌনাসক্তি। মানবেন্দ্রবাবুর বাসায় কাজ খুঁজতে আসা সুশ্রী নারীটিকে দেখে তারানাথ গোপনে কামনাসক্ত হয়ে পড়ে। বড় দাদার জেরার মুখে তারানাথ স্বীকার করে :

> মানবেন্দ্রবাবুর বাসায় সে কাজ খুঁজছিল। মানববাবুরা এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন। এ ঝি-টার কথা তিনি আমাকে রাখুন। পাঁচ টাকা মাইনেয় সব কাজ করতে রাজি আছে। খুব খাটতে পারে, বেশ পরিষ্কার, ব্যবহার ভালো, এইসব বলছিলেন তিনি।...

> কিন্তু এইসবের জন্য নয়, মেয়েটির বাইশ-তেইশ বছর মাত্র বয়স। দেখতে বেশ সুস্থ এবং—'একটু চুপ করে থেকে কাকা —'সুশ্রী।'[৯]

নারীটি সম্পর্কে তারানাথের স্বীকারোক্তি অকপট। সে বলেছে, 'একবার এ বাড়ির কাজে লেগে গেলে নিজেকে সামলাতে পারতুম না হয়তো।'[১০] এবং পরিশেষে স্পষ্ট হয় তার তীব্র ইন্দ্রিয়তাড়না— 'কিন্তু বুঝলুম মায়াममতাই নয়, চাচ্ছি অন্য কিছু।'[১১] কেবল সুশ্রী এই নারীটিই নয়, তারানাথের বাসনাবহ্নি তাকে কোলকাতার নিষিদ্ধ পল্লিতে পর্যন্ত নিয়ে যায় বহুকাল আগে এবং তার এই বহুগামিতাই তার জীবনের চূড়ান্ত ট্রাজেডিকে নিশ্চিত করে: 'স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিন-চার মাস পরে আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম। মনের অবস্থা ভালো ছিল না তখন। কলকাতার থেকে একটা গোপন রোগ নিয়ে আমি ফিরেছি। তারপর বিয়ে করবার কোনো পথ নেই আমার।'[১২] পুঁজিবাদী সমাজের ঔপভোগিক প্রলোভন তারানাথের ব্যক্তিঅস্তিত্বের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে।

'অশ্বত্থের ডালে' গল্পটির আবহ অতিপ্রাকৃতধর্মী। অন্ধকার ও শীতের জ্যোৎস্নারাতের পটভূমিকায় এক রহস্যময় কবিতার ঘোর তৈরি করেছেন গল্পকার এবং এই কাব্যগন্ধী বাস্তবতার মূলে নির্মলের বিচ্ছেদ ও নৈঃসঙ্গ্যযন্ত্রণার উন্মোচন লক্ষ করা যায়। পাড়াগাঁয়ের নির্জনতায় গভীর রাতে পেঁচার ডাক শুনে তন্দ্রাহতের মতো নির্মল বেরিয়ে আসে এবং পাশেই মজুমদারদের শূন্য বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার পাহারাদার বংশলোচনের কাছে জানা গেল হরনাথ মজুমদার এবং তার স্ত্রীই মৃত্যুর পর পেঁচা হয়ে গাছে ঠাঁই নিয়েছেন। মজুমদার দম্পতির যৌথ দাম্পত্যের বিপরীতে নির্মলের একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা যেন প্রকট রূপ নেয়। কারণ :

> ঘরের উত্তর দিকের একটা কোণে আমার কোঠা। ছোট্ট একটা কোঠা। একটা টেবিল রয়েছে, একটা চেয়ার, বইয়ের আলমারি একটা, আর খাট একখানা। আমি একাই এখানে থাকি। বিয়ের আগে যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। নিজেকে অবিবাহিত একাকী মানুষ ভাবতে বেশ লাগে।[১৩]

মজুমদার দম্পতির প্রেম মরণোত্তর সময়ে টেকসই হলেও শিল্পতাড়িত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সময়ে নির্মলের একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তীব্র হয়ে ওঠে। যুগযন্ত্রণার কালো অমোঘ ছায়া ব্যক্তির জীবনকে নখরবিদ্ধ ছিন্নভিন্ন ক'রে ক্ষণস্থায়িত্বের দিকে ঠেলে দেয় বলে নির্মল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রশ্রয় খোঁজে।

জীবনের অর্থহীনতা ও বীতস্পৃহার মধ্যে নিমজ্জমান ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের আখ্যান 'কুড়ি বছর পরে'। কয়েক বন্ধুর আত্মমগ্ন স্মৃতিচারণা এমন এক বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে অপেক্ষা করে বিষাদ, ক্লান্তি, বিশ্বাসহীনতা এবং অন্তর্গত ভঙ্গুরতা। এই গল্পটিকে মানুষের সত্তাসন্ধানের গল্পও বলা যায়। অনেক স্বপ্ন-স্মৃতি-রোমাঞ্চ ও বিগত দিনের তীব্র শিহরনের পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষ এমন একটি বাস্তবতায় উপনীত হয় যেখানে সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে আছে উদ্দেশ্যহীনতা, ভাঙন এবং নৈঃসঙ্গ্য। নীরেন, পীতাম্বর, অনিল এবং গল্পকথক শিবরাম স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পুরোনো বন্ধুদের কথা স্মরণ করে। এভাবেই তারা খুঁজে পায় ঈশ্বর শর্মা ও যোগেশ বন্ধুদ্বয়কে। কিন্তু তাদের সব থেকে প্রথাবিরোধী ব্যতিক্রমী বন্ধু অবিনাশ এক বিস্ময় নিয়ে শিবরামের মুখোমুখি হয়। মহানগর কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে শিবরাম অনেক সাধ্যসাধনা করে তার দেখা

পায়। প্রথম সাক্ষাতেই বিনাশ শিবরামকে বলে, 'আমার এখানে দু-একটি পরলোকের আত্মা আসেন, আমি তাদের সঙ্গেই থাকি।'[১৪] এই অপ্রাকৃত আবহ গল্পে রহস্যময়তার জন্ম দেয় এবং শিবরাম বুঝতে পারে, অবিনাশ যে জগতের কথা বলছে তা কখনো স্বাভাবিক মানুষের কাম্য নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈনাশিক বাস্তবতায় ব্যক্তির মনোজগতে তৈরি হয় ধস এবং এবং ক্ষয়, হতাশা ও রুগ্‌ণতা জন্ম দেয় বৈকল্যের। ফলে অবিনাশ ঘোষাল এখন আর অন্ধকারের কোনো বিকল্প খুঁজে পায় না। তার সামনে যে পৃথিবী, তা অচেনা এবং কোনো ইশারা নিয়ে আসতে পারে না তা। আলোস্নিগ্ধ রোমান্টিকতার জগৎ থেকে পলাতক হয়েছে অবিনাশ এবং একারণেই তার মীমাংসা–

> এ পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ থাকতে পারে না যার জন্যে অন্ধকারের ভিতরেও আলো জ্বালতে হয়। শিবরাম, তুমি কিছুই জান না। তুমি আমার সঙ্গে থাক। আমি তোমাকে এমন জিনিস বুঝিয়ে দেব। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবে সব। এমন শান্ত সুন্দর সংসর্গ পাবে যে কিছুতেই আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইবে না তুমি।[১৫]

'কোনো গন্ধ' এক প্রত্যাশাহীন ফিকে জীবনের কথকতা। সুধীশ ও কাঞ্চনমালার দাম্পত্যজীবন চোরাবালির গভীরে নিমজ্জিত। ভিন্ন বিছানায় রাত কাটায় যে সুধীশ, তার বৈবাহিক জীবন বহু আগেই ভেঙে চৌচির, –'দরজা খোলাই ছিল। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় গিয়ে ঢুকল সে। বিবাহিত হয়েও একা বিছানায় একা শোবার সুবিধা তার হয়েছে। তার কারণ বিয়েটা গেল বোশেখের আগের বোশেখে হয়েছে, ছাতকুঁড়োর সোঁদাল গন্ধ ধরে গেছে দাম্পত্য জীবনের ওপর, বোঝা যায় না, সেটা মিষ্টি না তেতো, কিন্তু পুরনো বটে, ঢের পুরানো।'[১৬] গল্পকার জীবনানন্দ আখ্যানটিতে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার যৌথ বিন্যাসে সুধীশ ও কাঞ্চনমালার মিশ্র জীবনাবেগকে উন্মোচন করেছেন। নির্জন রাতের পটভূমিকায় রোমান্টিকতার মায়াকল্প সৃষ্টি করলেও গল্পটির কেন্দ্রীয় টান জীবনের ব্যর্থতা ও লক্ষ্যহীনতার দিকে। জীবনানন্দের গল্পে ফুটে ওঠা রোমান্টিক বস্তুজগৎ বর্ণিল ও বহুমাত্রিক। কিন্তু এই মায়াবী রোমান্টিকতা ইতিবাচকতার অভিমুখী নয়। পরপর তিনদিন কলেরার ডিউটি করে আসলেও সুধীশ সময়মতো এককাপ চা পায় না, 'সুধীশের শরীরটা মোটেই ভালো লাগছিল না। ঘুমের থেকে উঠে বিছানার ওপর খানিকক্ষণ সে বসে রইল। কেউ চা তৈরি করে আনেনি। বস্তুত সুধীশ ঘুমুচ্ছে কি জেগে উঠেছে সে সব জেনে দেখবার কোনো কৌতূহলও কারু নেই।'[১৭] এই হতাশানিমজ্জিত সময়ের কালো অন্ধকার কাটিয়ে সুধীশ জেগে ওঠে শ্যালিকা শুভার আবির্ভাবে। বিমর্ষতায় ন্যুব্জ সুধীশ শুভার মধ্যে আনন্দ ও মুক্তির ইশারা দেখতে পায়। সে বলেছে, 'এই কদিন ফিনাইল আর স্টুলের গন্ধে ভুলে গিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে ভরসাজনক কোনো গন্ধও আবার আছে নাকি?'[১৮] এই মুক্তি ও উচ্ছ্বাস সুধীশের প্রেমহীন জীবনের একমাত্র খোলা বাতায়ন।

নরনারীর উজ্জীবিত প্রেম ও তার ক্ষয়িষ্ণুতার অনুভূতি জীবনানন্দের গল্পে পৌনঃপুনিকভাবে উঠে এসেছে। একদা ঘনিষ্ঠতর প্রেম ও ব্যাকুলতা বাস্তবতার সংযোগে মৃতকল্প হয়ে ওঠে এবং প্রণয়বিহ্বল নরনারী ক্রমশ দূরাগত হয়ে ওঠে। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' কিংবা 'উপেক্ষার শীত'

গল্পদুটি বীতপ্রণয়ের দীর্ঘশ্বাসে কাতর। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটিতে বিনোদ ও সরোজিনীর দাম্পত্য জীবনের কথা প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে, গল্পের প্রতিপাদ্য হয়েছে বিনোদ তথা হিমাংশু ও অরুণার বিগত প্রণয়ের স্মৃতিকথা। নিজের জীবনকথা নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে বিনোদ নিজেই হয়ে যায় হিমাংশু। আর তার প্রণয়িনী অরুণা। কিন্তু হেমন্তের বিষণ্ন দিনের ঝরা পাতার মতো একদিন হিমাংশুও উপলব্ধি করে, –'অরুণার ভালোবাসা ফুরিয়ে যাচ্ছে।'[১৯] অরুণার উপেক্ষা ও অবহেলা হিমাংশুর আবেগের স্ফুলিঙ্গকে নিবিয়ে দেয়। ফলে সরোজিনীকে বিয়ে করে হিমাংশু তথা বিনোদ বিগত স্মৃতিময়তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। রোমান্টিক প্রণয়ে স্বল্পস্থায়ী মোহ শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায় না। এ কারণে দেখা যায়, –'কিন্তু সে ভালোবাসা এখন আর নেই; অরুণাও যখন বিয়ে করল, তখন তেমন কিছু একটা আঘাতও লাগেনি বিনোদের।'[২০] সময়ের চক্রে জীবন নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরে এবং সেই পরিক্রমায় ক্ষয় হতে থাকে প্রেম-আবেগ ও পুরোনো সত্য। তাই বিনোদও অরুণার উত্তপ্ত প্রেম এখন ধূসর ও মৃতকল্প।

'উপেক্ষার শীত' গল্পটিও প্রেমহীনতার আখ্যান। শরদিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠানে তার প্রেমিকা অরু সেনগুপ্তও এসে হাজির। প্রেম-অপ্রেম, আবেগ-আবেগহীনতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে এই দুজনের সম্পর্কসূত্র চিহ্নিত। হেমনলিনীকে বিয়ে করে শরদিন্দু দাম্পত্য জীবনের সূচনা করতে চাইলেও তার মনোজগতে অরুর স্মৃতি উজ্জ্বল। দুজনের প্রেমে অনিশ্চয়তা এবং সংশয় শরদিন্দু বা অরুকে কোনো নিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয় না। শরদিন্দু অরুকে বিয়ের আগে বলে, 'যে সময় তোমাকে ভালোবাসা দিতে পারবো না আর, তার ঢের আগেই আমার ভালোবাসাকে তুমি অপ্রয়োজনীয় মনে করবে, আজই হয়তো করছ–কিছু কিছু অন্তত'[২১] এ আখ্যানে অরু-শরদিন্দুর প্রণয়চর্চা আছে, প্রেম নেই সত্যিকার অর্থে। ফলে সমস্ত আখ্যানে প্রেমের ক্লান্তি-বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের আবহ দুজনকে ঠেলে দেয় অমীমাংসায়, দ্বিধায়, গন্তব্যহীনতায়।

প্রচ্ছন্ন টোটেমিক আবহে সত্য হয়ে ওঠা নিয়তিবোধ 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পে ছায়া ফেলেছে। জীবনের ব্যর্থতা, নৈঃসঙ্গ্য ও পরাভবের বিষণ্নতা গল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এক মুখ্য মোটিফ হিসেবে। সন্তানহীন সুধাংশু ও নির্মলার দাম্পত্য জীবন নিরানন্দভাবে কেটে যায়। কিন্তু স্ত্রী নির্মলা নিজের ওপর অনুভব করে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। পাঁচ বছরেও মা হতে না পারার ব্যর্থতার জন্যে তাকেই দায়ী মনে করা হয়। এই চাপ নির্মলাকে এক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয় এবং একধরনের নিয়তিবোধ তাকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করতে থাকে। নির্মলার এই নিয়তিবোধেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়– 'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তুমি বিয়ে করো।'[২২] দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা নির্মলার এই উচ্চারণের মধ্যে তার অব্যক্ত যন্ত্রণার ইঙ্গিত উপেক্ষার নয়। কিন্তু অনবরত নীরব জ্বরের পথ ধরে নির্মলা তার গোপন নিয়তির ডাক শুনতে পায়। আপিং যে ব্যাধি সারাতে পারেনি, নির্মলা তার অবসান খুঁজে নেয় আত্মহননের মাধ্যমে– 'তিন ঘণ্টার ভিতরেই সে শেষ হয়ে গেল।'[২৩] মৃত্যুর পর পেঁচা আর জোনাকির রূপে নির্মলা বিভ্রম ছড়ায় সুধাংশুর মধ্যে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় নানারকম প্রাণী, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, গাছ-গাছড়া, ফল-মূল প্রভৃতিও

টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এদেশীয় চিন্তায় ও সংস্কারে পেঁচা নিয়তি ও মৃত্যুবোধের প্রতীককল্প হিসেবে বিবেচিত। জীবনানন্দের কবিতা ও গল্পে পেঁচার মোটিফ নানা মাত্রায় উপস্থিত। আলোচ্য গল্পে নির্মলা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে পেঁচার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে বলে সুধাংশুর ধারণা। তার মনে হয়েছে– 'জোনাকিগুলো নিভে যায়, জ্বলে ওঠে, ডালপালার ভিতর পিছলে পিছলে পড়ে, যেন কোনো শিশু খেলা করছে তাদের সঙ্গে। খুব শিশুসুলভ হৃদয় ছিল কল্যাণীর, কত খেলাই না সে খেলত। এখন মৃত্যুর পর বুঝি জোনাকি পেঁচা আর জটাওঅলা গাছের পিছু নিয়েছে।'[২৪] নির্মলাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সুধাংশুর মনোজগতে টোটেমীয় ধারণার প্রাচীন ছায়া পরোক্ষে লক্ষণীয়।

জীবনানন্দের গল্পে রোমান্টিকতার লঘু হাওয়া তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভীতসন্ত্রস্ত ভেঙে পড়া মানুষের অভিব্যক্তিই তাঁর গল্পের পরিসরজুড়ে ব্যাপ্ত। হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণা ও পীড়ন জীবনানন্দীয় গল্পের পটে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসবের মধ্যেও বাসন্তী হাওয়ার ইশারা মেলে তাঁর গল্পে। 'প্রণয়হীনতা' গল্পটি এক উন্মুক্ত খোলা জানালা। রোমান্টিক মৃদু হাওয়ার স্পর্শে এ গল্পে অদৃশ্য হয়ে গেছে সুধাংশুর মনোবেদনা। একদা কংগ্রেসকর্মী সুধাংশুর বোহেমিয়ান জীবনে এখন আর কোনো পিছুটান নেই। দিল্লিযাত্রার পথে সুশ্রী লাবণ্যময়ী নির্মলার সঙ্গে পরিচয় ও কথালাপ সুধাংশুর লক্ষ্যহীন জীবনে মুহূর্তের জন্য নিয়ে আসে গভীর আনন্দ ও রোমাঞ্চ। কিন্তু এই রোমাঞ্চ তাকে আর বিদিশা বেপথু করে তোলে না। ধাবমান ট্রেনের গতি ও শব্দের সঙ্গে সুধাংশুর জীবনের হঠাৎ জেগে ওঠা কোমল অনুভূতিও স্থায়ী হয় না। কারণ ততোদিনে সুধাংশু জেনে গেছে– 'মিছেমিছি কথা বাড়িয়ে, গল্প বাড়িয়ে মায়া বাড়িয়ে কি লাভ? হৃদয়াবেগ নিয়ে খেলা করতে গেলে দুঃখ পেতে হয় শুধু'।[২৫] জীবনানন্দ গ্রামীণ ও মফস্বলীয় পটভূমিকায় অধিকাংশ আখ্যান সৃষ্টি করলেও শহুরে বা নাগরিক পরিসরও তাঁর গল্পে অনুপস্থিত নয়। কলোনিয়াল কলকাতার উঠতি চাকচিক্য লেখকের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। সেই পর্যবেক্ষণ তাঁর বেশকিছু গল্পে বিধৃত হয়েছে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প'টির আখ্যান গড়ে উঠেছে মেট্রোপলিটান আবহে। গল্পের ল্যান্ডস্কেপ নাগরিক, বস্তুবিন্যাস, শব্দচয়ন ও পিকটোরিয়াল ন্যারেটলোজিতে ঔপনিবেশিক মহানগরীর প্যাটার্নই স্পষ্টতা পেয়েছে। গল্পের সংকটটিও নাগরিক জটিলতা-আশ্রয়ী। বহু আগে বকমোহানা নদীর তীরে পাঁড়াগায়ের নিবিড় নির্জনতায় সোমেন ও শচীর যে প্রণয় গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্ক ভেঙে এখন শচী প্রকাশের স্ত্রী। বন্ধু প্রকাশের কাছে স্বল্প বেতনে পত্রিকার চাকরি খোঁজার সূত্রে সোমেনের অবির্ভাব। প্রকাশের অনুপস্থিতিতে সোমেন শচীর ঘনিষ্ঠ হয়। শচীর মধ্যে পুরোনো প্রেম জাগ্রত হয়, সে ফিরে যেতে চায় বকমোহানা নদীর ধারে। কিন্তু ভাবালু রোমান্টিকতার অন্তঃসারশূন্যতাকে সোমেন পাত্তা দেয় না। বিগত দিনে শচী ও সোমেন দৈহিক সম্পর্কে মেতে উঠলেও সোমেন জানে :

> আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে কোন প্রয়োজনে লাগাতে পারে–শচী সেজন্য প্রস্তুত–ব্যাকুল কিন্তু এই সোফার ওপর? বকমোহানা নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে?
>
> ভাবতে গেলেও ব্যথা–ভাবতে গেলেও ব্যথা।

> এই কামরার ভেতর এক মুহূর্তের জন্যও আর টিকে থাকতে পারছে না। সোমেন একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরেই রাস্তায় উঠলো গিয়ে।[২৬]

এই গল্পের টেকচারে গুরুত্ব পেয়েছে শহুরে মোটিফ। কলোনিয়াল পুঁজির প্রভাবে গড়ে ওঠা মহানগর কলকাতার আধুনিকায়নের চিত্র শচীর চোখে ধরা পড়েছে এভাবে :

> বড় রাস্তার দিকের জানালাটার পাশে এসে রাতের কোলকাতার দিকে একবার তাকাল সে—ট্রামলাইনগুলো খালি পড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময় ...হু হু করে দুটো ট্যাক্সি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে—তাদের কাছে মহিষের গাড়িগুলোর অবসর অসীম;[২৭]

এই গল্পের সম্মুখভূমিতে নগর কলকাতার এটিকেট ও আবহ থাকলেও নেপথ্যে বা পটভূমিকায় গ্রামীণ জীবন বা আইডিলিক ইমেজের উপস্থিতি জীবনানন্দীয় গল্পের স্বরূপকে তুলে ধরে। ইমেজারি সৃষ্টিতে জীবনানন্দ গ্রামীণ মোটিফকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এই চিত্রকল্পময়তা বা ইমেজিজম তাঁর গল্পকে দিয়েছে কবিতার সুষমা। অন্য অনেক গল্পের মতো এ গল্পেও তাঁর এই শিল্পসিদ্ধির সাক্ষ্য মেলে :

> সোমেন বললে—মনে পড়ে একদিন বকমোহানার নদীর পাড়ে ভাঁটশ্যাওড়া জিউলি ময়নাকাটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধ ক্রোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে 'খুব পারবো চিনে যেতে—কতোবার গিয়েছি!' কিন্তু একবারও যাওনি, আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাৎলা শরপুঁটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইর মতো নদী ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—জলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চর—তোমার ঠাণ্ডা শরীর কতোদিন আমার হৃদয় শাসন করেছে।[২৮]

তিরিশের দশকের গল্পেও জীবনানন্দ তাঁর চিন্তাসূত্রে আত্মজৈবনিক ছায়ায় সঞ্চরণশীল ছিলেন। কলোনিয়াল সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের চিত্র প্রখর না হলেও তাঁর গল্প সেই সমকালীনতাকে স্পর্শ করেছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নহীনতার ইতিবৃত্ত ব্যক্তি-জীবনানন্দকেও আচ্ছন্ন করেছে। ফলে সমকালীনতার জটিল বৃত্তে ব্যক্তিও পরাভূত হয় অনিবার্যভাবে। 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে অনাদির পরাভব ও মৃত্যুও যুগযন্ত্রণার আঁচ থেকে দূরে নয়। কলোনির শাসনের বিরুদ্ধে দূরে থাক, নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তিও নেই অনাদির। এই গল্পে জীবনানন্দের আত্মজৈবনিক বাস্তবতা ট্রাজিক টোনে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষ্মাব্যাধিগ্রস্ত অনাদি স্ত্রীর কাছেও দারুণভাবে উপেক্ষিত। অনাদি চল্লিশটি খাতায় লেখা তার সমস্ত কবিতা ও রচনা বন্ধু লোকনাথকে দিয়ে যায় প্রকাশের জন্য। অনাদি বলেছে :

> বাক্সটি তোমাকেই দিয়ে যাব; চল্লিশটা খাতা আছে। তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাব। আমি গরিব মানুষ, তোমাকে কোনোই পুরস্কার দিতে পারলাম না। কিন্তু আমার মৃত্যু যেন সামান্য কেরানির মৃত্যু হয় লোকনাথ। এই খাতাগুলো যেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।[২৯]

জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাও ট্রাঙ্কবন্দি হয়ে পড়েছিল কলকাতার বসতভিটেয়। কবির মৃত্যুর পরই কেবল তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়। সময়-সমাজ-পরিবারবিচ্ছিন্ন অনাদির নেপথ্যে

এক সঙ্গবিবিক্ত কবির মুখ প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি স্বয়ং জীবনানন্দ। ব্যক্তিজীবনের পটে কবি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত স্ত্রীপ্রত্যাখ্যাত অনাদির ক্ষয় ও জীর্ণতাকে অবলোকন করেছেন। স্বামী অনাদিকে একা ফেলে কন্যাকে নিয়ে স্ত্রীর পিতৃগৃহে অবস্থান অনাদির প্রতি তার নির্দয় মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটায়।

তিরিশের দশকের দ্বিতীয় পর্বে লেখা 'এক এক রকম পৃথিবী' গল্পটিতেও কবির নিজস্ব অবয়ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই গল্পের অবিনাশ কবিরই আত্মপ্রতিকৃতি। এই গল্পটি অবিনাশের নিরন্তর পর্যটনের গল্প। তার মনোভূগোলে সময় এক শৃঙ্খলহীন অনন্ত পরিক্রমার মতো। মনোময় পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে এক গভীর ঘোর ও আচ্ছন্নতার দিকে এগিয়ে চলেছে অবিনাশ। রামজীবন বলেছে– 'পৃথিবীর রৌদ্রে রৌদ্রে অস্থির হয়ে ঢের বেড়িয়েছেন আপনি, আজও বেড়াচ্ছেন, কতকাল বেড়াবেন তা আমি জানি না,'[৩০] পৃথিবীবিলগ্ন কবি পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোলাহল ছেড়ে সৌন্দর্যময়ী এক নারীর অনুধ্যানে পরিভ্রমণরত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধূসর পথ পাড়ি দিয়ে সৌন্দর্যময়ী নারীর অন্বেষায় যে-কবি বনলতা সেনের প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন, এ গল্পেও হাজার বছরের অন্ধকার ও ঝিনুকের মতো জোছনার মধ্যে সুন্দরী সাপিনী হয়ে কবির সেই রোমান্টিক নারীর ইশারা জেগে ওঠে:

> কিন্তু অবিনাশের কামনা বৈষয়িক কৌতূহলের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। অবিনাশ যে রূপসিকে চিনেছেন সে সুন্দরী সাপিনী হয়ে হাজার হাজার বছর অন্ধকারে খেলা করে বেড়ায়–যে সাপিনীকে তিনি তাকিয়ে দেখেন মুহূর্তের ভিতরেই রূপসী নারীর মতো অবিনাশের ধূসর পালঙ্কের কাছে জড়িয়ে থাকে–।[৩১]

সমগ্র গল্পটি বিন্যস্ত হয়েছে কবিতার শরীর নিয়ে। অবিনাশের সৌন্দর্যাভিলাষ যেন 'বনলতা সেন' কবিতার সেই পরিব্রাজক কবির মতো যিনি সিংহল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অনির্দেশের পথে।

জীবনানন্দের প্রেম ও দাম্পত্য জটিলতাকেন্দ্রিক গল্পগুলোতে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রবল, উচ্চকিত এবং আধিপত্যকামী। এই পর্বের গল্পে স্বামী বা পুরুষের আচরণ কিংবা প্রতিক্রিয়া কোমল, ভীরু ও অবদমিত। সোজা কথায়, জীবনানন্দের পুরুষরা নারীর মতো আর নারীরা পুরুষকল্প। জীবনানন্দ যেহেতু চাকরিমুখী, অর্থ-উন্নতি বা বৈষয়িক (ক্যারিয়ারিস্ট) মনস্তত্ত্বের মানুষ নন, তাঁর গল্পের নায়কেরা সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বেকার-অর্ধবেকার কিংবা পুরোপুরি কর্মহীন। এই বেকারত্বের সূত্রেই তাঁর গল্প ঘন হয়ে উঠেছে দাম্পত্য দ্বন্দ্বে ও জটিলতায়। জীবনানন্দের গল্প আলো ঝলমল দুনিয়ার রোশনাই ছড়ায় না, বিষণ্ন মনের আলোছায়ায় ব্যক্তির অন্তর্জগৎ পাখা মেলে তাঁর আখ্যানে। ভোগতৃপ্ত পুঁজিবাদী সময়ের পটে জীবনানন্দ গল্প রচনা করলেও বহির্বিশ্বের জমজমাট চেহারা সামান্যতম আঁচড়ও ফেলেনি তাঁর গল্পে। উত্তম পুরষে লেখা গল্পগুলোতে চরিত্রের উচ্চারণ খুবই অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ ও মনোময়। বলা যেতে পারে জীবনানন্দের গল্প তাঁর মনোকথনেরই প্রকাশ্য রূপ।

## তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ, ৩৮৩
২ *জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র*, ভূমিকা, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৩
৪ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪৭
৫ সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩২৩
৬ *জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র*, মাংসের ক্লান্তি, পৃ. ৩১
৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৬
৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১
১০ প্রাগুক্ত
১১ প্রাগুক্ত
১২ প্রাগুক্ত
১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১
১৫ প্রাগুক্ত
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৮ প্রাগুক্ত
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০
২৪ প্রাগুক্ত
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬
২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৪
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৫
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৭
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮